"তোমারই রহমতে খোদা"

(দুটি রোগ মুক্তিতে লেখকের কৃতজ্ঞতা)

৩০/১২/৯৮
গুলমেহের
৬৩ সেন্ট্রাল রোড
ঢাকা-১২০৫

নুরুল ইসলাম
(জাতীয় অধ্যাপক)

লন্ডনের পথে যাত্রা

চিকিৎসা শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্রিটেনের তিনটি রয়েল কলেজের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের অনুসরণ করে পাকিস্তান কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স এ্যান্ড সার্জনস্ প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬২ সালে। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এ্যান্ড সার্জনস্ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে। বাংলাদেশে সকল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ এখানকার FCPS বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ ফেলোশিপপ্রাপ্ত, FCPSএই ফেলোশিপ রয়েল কলেজের মতো কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে দেয়া হয়, যেখানে পাসের হার শতকরা ১০-২০ ভাগ অর্থাৎ রয়েল কলেজের প্রায় সমান। রয়েল কলেজের পরীক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন এখানকার কোন কোন পরীক্ষা তাদের চেয়েও কঠিন। প্রায়ই প্রত্যেক পরীক্ষায় রয়েল কলেজ কিংবা সমমানের অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষক আনা হয়। এতদসত্ত্বেও অনভিজ্ঞতার কারণে BCPS এর পরীক্ষা সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। এই কারণে সাম্প্রতিককালে কলেজ কর্তৃপক্ষ এই মান রক্ষায় কিছুটা উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং রয়েল কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা শুরু করে। ইতোমধ্যে রয়েল কলেজ এই অঞ্চলের কোন কোন দেশে (থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া,নেপাল) MRCP প্রথম ভাগ পরীক্ষা নিতে শরু করে। এতে উৎসাহিত হয়ে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়নস্ এ্যান্ড সার্জনস্ জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলামের মাধ্যমে অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য এডিনবরা রয়েল কলেজের ওভারসিজ ডাইরেক্টর ডাঃ রোনাল্ড ক্লার্ক ঢাকা আসেন এবং সুদীর্ঘ আলোচনার পর যৌথভাবে পরীক্ষা নেবার ব্যাপারে একমত হন। এ বছরের প্রথমদিকে নিয়ে একটি ডেলিগেশন ব্রিটেনের রয়েল কলেজের সাথে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে একটা কর্মসূচী প্রণয়ন করবে।

ডেলিগেশনের গঠন নিম্নরূপঃ

১। অধ্যাপক মোঃ তাহির (প্রেসিডেন্ট BCPS)

২। নাজমুন নাহার (সেক্রেটারী BCPS)

৩। অধ্যাপক মাহমুদ হাসান (ভাইস প্রেসিডেন্ট BCPS)

৪। অধ্যাপক রশিদ-ই-মাহবুব (সভাপতি BMA)

৫। জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম

সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা হিসাবে এডিনবরা কলেজের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাকে ডেলিগেশনে যোগদানের অনুরোধ জানালে এতে সম্মত হই। অবশেষে ডেলিগেশনের সকল সদস্য ১৯৯৮ সালের ৩১শে সেপ্টেম্বর রাতে ঢাকা থেকে বিমানে রওনা হয়ে ১লা অক্টোবরে লন্ডনে পৌঁছেন। আমার থাকার ব্যবস্থা আমি নিজেই করেছিলাম রয়েল কলেজের অতিথি ভবনে ৯ নং সেন্ট এন্ড্রুস্ প্লেসে। কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ প্রধান অফিস ছিল একই রাস্তার ১১ নম্বরে। সকাল বেলা নাস্তা করে ১০-৩০ মিঃ আমি রয়েল কলেজের লাইব্রেরিতে যাই এবং জাতীয় অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডাঃ মরহুম ইব্রাহিমের জীবনী সম্পর্কিত আমার লেখাটা Munk Manuae থেকে বের করে ফটোকপি করে নেই। সেটা করতে গিয়ে এক চোখে ঝাপসা দেখে সোজা বাতির নিচে পিছনে চেয়ারে গিয়ে যখন ঠিকভাবে বসতে চেষ্টা করি, মনে হলো সমস্ত শরীর যেন হাল্কা হয়ে গেছে। আমি সামলাতে পারছি না। দূর থেকে কে যেন বলল Don't try, lie down(চেষ্টা কর না, শুয়ে পড়। পরে জেনে নিয়েছি তিনি ছিলেন MRCP Part II পরিক্ষার্থী নাম জানা যায়নি।) আমি তখন হাত ছেড়ে দিয়ে কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়লাম। তখনই কে একজন আমার বামহাত চেপে ধরে কয়েকটি প্রশ্ন করল Do you have any pain in the chest (তোমার বুকে ব্যথা হচ্ছে) Any palpitation or sweating (বুক ধড়ফড় করছে, ঘাম হচ্ছে?) সব না সুচক জবাব দিলে তিনি যেন খুব জোরে

আদেশ দিলেন, আমি যেন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ি। আমি তাঁর আদেশ মেনে নিলাম। দুই কি তিন মিনিটের মধ্যে এ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেছিলেন সোসাল সেক্রেটারি অফিসের Mr. Michael Finn এবং Ms Angela Bachtler. আমাকে তুলে ইউনিভার্সিটি কলেজ হাসপাতাল নিয়ে গেল। পরে কিছুই আর জানি না। জ্ঞান ফিরলে জানতে পারলাম আমি নাকি দুই দিন সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিলাম।

দুর্দিনের অদ্ভুত স্বপ্ন

আমার মনে হলো এ দুদিন আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। সেটা হলো আমাকে এবং আমার মাকে একই সাথে একই কবরে দাফন করা হয়েছে। একই কবরে দুই জন পাশাপাশি, মায়ের ওখানে কদিন আমি বেড়াতে যাই, বিভাজক এর নিচে দিয়ে আমি কবরের একপাশে মায়ের লাশ আরএক পাশে মাটিতে একটা গর্ত এবং আলো দেখতে পেলাম। দ্বিতীয় দিনে মনে মনে ভাবলাম দুই দিন হলো কবরের আলোটা জ্বলছে, দেয়াল ঠিকই আছে, কোন আজাব হলো না কেন? মনে হলো হয়তো বা আমার মায়ের গুনে পরম করুণাময় তাঁকে আজাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। একদিন পরে কন্‌সালট্যান্ট এসে বললেন, সেন্ট টমাস হসপিটালে 'স্ট্রোক' আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আমার সেখানেই যাওয়া উচিত। পরে আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। সেন্ট টমাসের বহুতল ভবনের ৯ তলায় মার্ক ওয়ার্ডের স্ট্রোক ইউনিট-এ Dr. Rudd- এর তত্ত্বাবধানে ২০ নং বিছানায় আমাকে রাখা হলো। সৌভাগ্যক্রমে ওখানে একটি বিছানা খালি ছিল। পরে বুঝতে পারলাম এখানকার সকল কর্মী বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীর সেবায় পারদর্শী। আমার যে নার্স ইনচার্জ ছিল তাঁর নাম ছিল Loyola Godsell। ঐ কামরায় তিনজন রোগী ছিল সম্পূর্ণ অচল, বাকশক্তিহীন। তাঁদের করুণ চাহনি দেখে মনে হতো আমি কতই না ভাল। আমার পাশের রোগীকে মিঃ টনী বলে সবাই উষ্ণভাবে সম্বোধন করত। পরে জানতে পারি, ভদ্রলোক বেশ ভাল হয়ে গিয়েছিলেন Carotid Surgery করতে গিয়েছিলেন। পরে Embolism হয়ে স্ট্রোক হয় এবং পরে ওর অবস্থা সুবিধা হয়নি। পারিবারিক দিক দিয়ে

তাঁর অসুবিধা ছিল। স্ত্রী পরিত্যক্ত সংসারে তাঁকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। তবুও অবসরপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে সোশাল সিকিউরিটি এবং পেনশনের টাকা দিয়ে তাঁর দিন কোনভাবে চলে যায়। এখানে আসার পর বিশেষ পরিচর্যা এবং ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে দিন দিন অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। কয়েকদিন পর আমি দেশে ফিরতে চাইলে Dr. Rudd কয়েকটি পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন আমি এখনও নিরাপদ নই এবং তিনি চান না যে আমি আর একটা স্ট্রোকে অকর্মণ্য হয়ে পড়ি। তাঁর কথা শুনে আত্মীয়স্বজনের সাথে কথা বলে আরও কিছুদিন থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার মেয়ে ডাঃ নীনা বলল কিছুতেই বাড়িতে যেতে দেব না। ডাঃ সাহেব যে পরামর্শ দিয়েছেন সেটা মেনে নিতে হবে। মনে মনে আমিও ওর কথাগুলো মেনে নিলাম এবং কিছুদিন পর প্রথমবার MRI(বিশেষ ধরনের এক্স-রে) করে অবস্থার কতটুকু উন্নতি হয়েছে দেখে বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ১০-১২ দিন পর আমার দ্বিতীয়বার MRI করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। আমার ভয় ছিল যদি খারাপ কিছু হয়। বাড়িতে জানিয়ে দিলাম ৩ তারিখ (অক্টোবর ১৯৯৮) বাংলাদেশ সময় ৩টা-৫টা(লন্ডন সময় ১০-১২ টা) শ্রদ্ধেয় মাওলানা আমিনুল ইসলামকে যেন আমার জন্য দোয়া করতে বলে। বাড়ির মিলাদে ডাঃ অদুদ, রুবী, নীলু, ফিরোজ, নবীদুর রহমান, নাহিদ, করিম সবাই উপস্থিত ছিলেন। আমি সেই দিনের অপেক্ষায় খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ২হতে ৩ তারিখে আমার MRI হলো, বাড়িতে মিলাদও হলো। একদিন পর Dr. Rudd দেখে সন্তোষ প্রকাশ করলেন যে, আমার (Coelateral Circulation) কোলেটারেল সারকুলেশন এবং সারকেল অব (Circle of willis) উইলিসের অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন আমি ইচ্ছা করলে বাড়ি যেতে পারি।

স্বাভাবিকভাবে খবরটা আমার জন্য সুখের এবং আনন্দের। একদিকে বিমানের লোকদের সাথে কথা ছিল আমি যেদিন যাব সেইদিন কিংবা তার আগের দিন তাদের ওখানে আমার জন্য সব ব্যবস্থা করে রাখবেন। ঢাকা থেকে মিসেস আমান এ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিল। প্রথমবার যখন MRI হয়, রিপোর্ট পাঠাতে ৭-৮দিন দেরী হয়েছিল। সেজন্য মেয়ে ডাঃ নীনা আগে থেকে লোকদের বলে রেখেছিল, যেন MRI রিপোর্ট সকালেই ওয়ার্ডে

পাঠিয়ে দেন। MRI রিপোর্ট পাওয়ার পরে মেডিক্যাল বোর্ড সিদ্ধান্ত নিল হাসপাতালে আমার না থাকলেও চলে। তারপর Dr. Rudd এর সাথে দেখা হলে দেখি MRI এর রিপোর্ট তার হস্তগত হয়েছে। নীনার দক্ষতায়, আন্তরিকতায় এবং আমার চিকিৎসার ওপর তার সজাগ দৃষ্টি আমাকে মাঝে মাঝে বিরক্ত করলেও প্রতিতুলনায় মুগ্ধ করেছে বেশি। বিশেষ করে ফিজিওথেরাপি ডিপার্টমেন্টে তার লক্ষ্য ছিল আমি যেন ঠিকমতো সব করি। অবশ্যই এই চিকিৎসার প্রয়োজন স্ট্রোক রোগীদের জন্য অপরিহার্য। Dr. Rudd সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, তাঁর অবস্থা অনেক উন্নতির দিকে। রক্ত চলাচলের উন্নতি হয়েছে। যদি চান বাড়ি যেতে পারবেন। তবুও কয়েকমাস খুব সাবধান থাকতে হবে। বেশি পরিশ্রম কিংবা টেনশনের কাজ করতে পারবেন না। তবুও সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেয়াই উত্তম। মনে মনে খুশি হলাম। ইফতেখার এবং নীনাও সন্তুষ্ট। তাঁদের টিকিট ছিল সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে এবং আমার ছিল বিমানে। তাঁদের সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের টিকিট বদলিয়ে বিমানের টিকিট নেয়া হয়। আমার আগে থেকেই প্রথম শ্রেণীর টিকিট ছিল।

ডাঃ এ,এফ, এম ইউসুফ

লন্ডনের প্রাক্তন হাই কমিশনার ডঃ এ,এফ, এম ইউসুফ আমার বাল্যকালের পরমহিতৈষী বন্ধু। হাসপাতলে এবং বাসাতে থাকাকালে প্রতিদিন সকাল-বিকাল ফোন করে আমি কেমন আছি খবর নিতেন। তাঁর কয়েকদিন আগেই চলে যাওয়ার কথা ছিল। আমার সাথে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে পরে তাঁর টিকেটের ব্যবস্থা করা হয়। আমার পাশের আসনে তাঁর টিকেটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরে বুঝতে পারলাম কেন তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। বিমান আকাশে ওঠার সাথে সাথে তিনি অন্য একটি আসনে চলে গেলেন আমার পাশের আসন খালি করে সেখানে নীনাকে বসিয়ে দিলেন। পরে কর্তৃপক্ষ নীনাকে অন্য একটি আসন দিয়ে আমার শোয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই আসনে আমি সারারাত ঘুমালাম। ঢাকার কাছাকাছি আসার পর আমার ঘুম ভাঙল। প্রথমে একটু ভয় থাকলেও পরে দেখলাম আমার কোন অসুবিধা হয়নি। ইউসুফ আমার ধন্যবাদ পাওয়ার মতো তবে

তিনি ধন্যবাদ পাওয়ার আশা করেননি। আমিও ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি। ঢাকায় বাংলাদেশ বিমানের মিসেস আমান আমার আত্মীয় সমতুল্য এবং হিতাকাঙ্ক্ষী। প্রতিদিন তিনি আমার খবর নিতেন। বিমানের আনুষ্ঠানিকতার কাজ তিনি আগে থেকেই করে রাখতেন, টিকেট রিজার্ভেশন হতে শুরু করে যাই হোক না কেন।

ঢাকা বিমানবন্দরে আগে থেকে হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। বাড়িতে সবাইকে খবর দেয়া হলো আমি কখন কিভাবে আসব। কাউকে কোন কিছু বেগ পেতে হয়নি। আমাকে বেশিক্ষণ বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে হয়নি। বাসায় এসে প্রথমে তিন তলায় যেখানে আমার মা জীবনের শেষ সময়টা কাটিয়েছেন সেখানে বসে মনে মনে শোকরিয়া আদায় করলাম। আমার অসুখের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য কি তা অনেকই ভাবতে পারেন। ঘটনা দুটো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

অন্য একটি ঘটনা

চার বৎসর আগে ১৯৯৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের কোন একসময় আমি চট্টগ্রাম যাচ্ছিলাম। USTC সিন্ডিকেট মিটিং এ সকালে ৭টা ৪৫-এর বিমানে। এয়ার পোর্ট VIP রুমে বসে আছি। রিপোর্ট করে বিমানের প্রবেশপত্র হাতে নিয়েছি। কিছুক্ষণ পর কেমন জানি বুকে অস্বস্তি লাগছিল। পাশে ছিলেন বাংলাদেশ রাইফেলস্ BDR প্রধান মেজর জেনারেল আনোয়ার সাহেব। আমাদের কুশল বিনিময় হল। এমন সময় তখনকার বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সচিব এসে সালাম করে জানাল 'স্যার পাশের রুমে সভানেত্রী আছেন আপনি যাবেন? আমি চুপকরে রইলাম কারণ তখন বুকে অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ভাবছিলাম এই অবস্থায় আমার চট্টগ্রাম যাওয়া আদৌ ঠিক হবে কিনা। এমন সময় বিমানের এক মহিলা কামরায় ঢুকলে ভাবলাম আমাকে ডাকতে এসেছে। VIP লোকদের এভাবে ডেকে নেয়া হয়। মহিলা বললেন স্যার আমরা দুঃখিত বিমানের ফ্লাইট ১০ মিনিট দেরী হবে। সেই মুহূর্তেই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমার যাওয়া ঠিক হবেনা। সাথে সাথে নীচে এসে আমার নির্ভরযোগ্য ড্রাইভার সামছুল হককে

ডাকলাম এবং বললাম আমাকে CMH এ নেবার জন্য। ১৫ মিনিটে যে আমাকে CMH নিয়ে গেল VIP রুমের সামনে। আমাকে রেখে তাকে আমি ভিতর থেকে যেকোন একজন ডাক্তার ডেকে আনতে বললাম। অতি অল্প সময়ে একজন ডাক্তার এসে বললেন স্যার আপনি এখানে? আমি তাকে বললাম 'I am not felling well'। সে হুইল চেয়ার নিয়ে এল এবং আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। ভালভাবে পরীক্ষা করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করল এবং সাথে সাথে চিকিৎসা শুরু হল। পরের দিন সকালে ECG করে দেখা গেল ১ম দিনের ECG-তে যা দেখা গিয়াছিল সেটা আর নেই এবং আমার নিজেরও আর কোন অসুবিধা লাগছিলনা এবং হৃৎপিন্ডের মাংস পেশীর কোন ক্ষতি হয়নি অর্থাৎ heart attack বলতে যা বুঝায় তা হয়নি। এ সম্ভব হয়েছে আল্লাহর অশেষ রহমতে ও সুচিকিৎসার ফলে। এরপরে প্রায় দুই সপ্তাহের মত আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলা হল। তারপর সিঙ্গাপুরে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল আমার হার্টের ৩টা শিরার রক্ত চলাচল ব্যহত। সেগুলোর অপারেশ্যন করতে হবে। অধ্যাপক বি চৌধুরীর সাথে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম Dr. Saw কে দিয়ে (Saw Huat Seong) অপারেশন করালে ভাল হবে। তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত সার্জন এবং তিনিই ডাঃ বি চৌধুরীর অপারেশন করেছিলেন। তাঁরই কাছে বাইপাস সার্জারি করে আমি সুস্থ হয়ে দেশে ফিরি।

বর্ণনার উদ্দেশ্য

প্রথমটিতে আমি একা সফর সঙ্গীদের মধ্যে ডাঃ মোঃ তাহিরকে অনুরোধ করেছিলাম আমার সাথে থাকতে। তিনি নাকি রশিদ-ই-মাহাবুব সাহেবকে কথা দিয়েছিলেন বাংলাদেশ হাই কমিশনের অতিথিশালায় থাকবেন। সেই কথা রাখতে না পারলে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। তাই তিনি আমার সাথে আসলেন না। সে কারণে আমি ছিলাম একা। সেখানে থেকে রয়েল কলেজ আসা-যাওয়ার খরচ ১০-১৫ পাউন্ড। সময় লাগে কমপক্ষে ১৫-২০ মিনিট। সবার সাথে না থাকার কারণ দলের সবাই ছিল আমার ছাত্র। তাদের সাথে একই বাথরুম ব্যবহার করা আমার জন্য কিছুটা অস্বস্তিকর

ছিল। এই অবস্থায় অনেক অসুবিধা হয় বলে রয়েল কলেজের অতিথিশালায় আমি আগে থেকেই ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। অধ্যাপক ডাঃ তাহির তখনও রাজি ছিলেন না। তা না হলে তাঁর জন্যও আলাদা কামরার ব্যবস্থা করা যেত। একজনের কামরা তাতে এটাচ্ড বাথরুম, টেলিফোন সবই ছিল। ভাড়া ছিল প্রতিরাতে ৬০ পাউন্ড। অতিরিক্ত একটা বিছানা ছিল সেটা ব্যবহার করলে ভাড়া পড়ত অতিরিক্ত ১৫ পাউন্ড। এটা আমি দিব বললেও ডাঃ তাহির একই অজুহাতে তাতে রাজি হননি বলে আমাকে একাই থাকতে হলো। ১০টা ২০ মিনিটে নাস্তা করে আমি রয়েল কলেজ লাইব্রেরিতে যাই সেখানে শুধুমাত্র উঁচু দরের চিকিৎসকগণ অর্থাৎ যাঁরা ফেলোশিপ লাভ করেছেন তাঁরাই পড়াশোনা করেন। আমি যে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি সেটা আধঘন্টা আগে হলে আমি হোস্টেলে একা পড়ে থাকতাম। কারন দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। কোন সাহায্য থাকত না, কেউ জানত না, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রশ্নই উঠত না। হয়ত বা আমি চিরনিদ্রায় শুয়ে থাকতাম। আর যদি ১০ মিনিট আগে হতো তাহলে আমি থাকতাম রাস্তায় ৯ এবং ১১ নম্বরের মাঝামাঝি। হয়ত বা নিজেকে রক্ষা করতে পারতাম না অর্থাৎ ১০ টা থেকে ১০-৩০ মিনিটের মধ্যে এই লাইব্রেরীর বাইরে যে কোন জায়গায় আমি আক্রান্ত হলে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হতাম। কোন স্ট্রোক-এর রোগীর এত সহজে অল্প সময়ে হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। এ দেশের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে General Practitioner পরে Specialist, তারপরে হাসপাতালে। এতে কত সময় লাগতে পারে এবং এটা যে মিনিটের ব্যাপার হতে পারে না তা সহজে বোঝা যায়। আর আমার বেলায় GP-এর প্রশ্নই উঠেনি। প্রথমেই Specialist এবং পরে হাসপাতালে। এ দুটো এক সাথে না হলে আমার রোগ কি পর্যায়ে যেত তা অনেকেই হয়ত অনুমান করতে পারবেন।

একজন মুসলমান হিসাবে পবিত্র কোরানের বাণী থেকে আমরা জানতে পারি "কোন কিছু হওয়ার জন্য আল্লাহতা'লার ইচ্ছাই যথেষ্ট।" তিনি যদি বলে, "হও" তাহলেই হবে, অমনি হয়ে যায়। নিশ্চয়ই তাঁরই ইচ্ছায় আমার এই রোগ। তা নাহলে ঘটনাটা এমন করে ঘটার আর কোন কারণ থাকতে পারে না। শুধু তাই নয়, বর্তমানে ব্রিটেনের যে কোন হাসপাতালে

অপেক্ষমাণ তালিকা সুদীর্ঘ। রোগী ভর্তিতে অনেক সময় লাগে। আমাকে হাসপাতালে নেয়ার সাথে সাথে ভর্তি করানো অস্বাভাবিক ছিল। সেখানেও বেগ পেতে হয়নি। আক্রমণের সাথে সাথে চিকিৎসকের আগমন ও ২মিনিটে ইমার্জেন্সি এম্বুলেন্সের উপস্থিতি ও সাথে সাথে হাসপাতালে ভর্তি এবং চিকিৎসা সব কিছুই ভাবতে গেলে আমি অবাক হয়ে যাই। আল্লাহতা'য়ালার অশেষ রহমত এবং তাঁর ইচ্ছা ছাড়া এসব কিছুই সম্ভব ছিল না। তিন দিন পরে ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে আমার জ্ঞান ফিরলে দেখি আমার একান্ত স্নেহের ভাগিনা আসিফ আমার পা টিপছে । পরে জানতে পারি আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিলাম।

আমার দেশে ফিরে আসার খবর যতটুকু সম্ভব গোপন রাখি। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাঙ্খীদের ঢল নামে সে ভাবনায়। তাহলে আমার চিকিৎসা ব্যাহত হবে আমার দুই ছেলে মেয়ে নীনা এবং ইফতেখার এ সম্পর্কে আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিল। কারণ আমার স্বভাব তাঁদের জানা ছিল। তাঁরা জানে লোকজনের সাথে কথা বলতে আমার ভাল লাগে। তবুও খবর পেয়ে যারা আসতে শুরু করল তাদের জন্য নিচতলায় একটি খাতা পাঠিয়ে দিলাম। সবাই এতে শুভেচ্ছা জানিয়ে নাম এবং ঠিকানা লিখে যায়। পরে জানতে পারি, আমার অসুখের খবর শুনে জাতীয় মসজিদ থেকে জামে মসজিদ, আমার গ্রামের সব মসজিদ এমনকি অনেক অফিসে, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম সমিতি, বিভিন্ন উপসনালয়ে প্রার্থনা এবং আরও অনেক জায়গায় মিলাদ এবং মোনাজাত হয়েছে। আমার রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে আর্জি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অন্যান্য ধর্মের লোকেরা যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের উপসনালয়ে আমার শীঘ্র সুস্বাস্থ্য কামনা করে প্রার্থনা করেছেন। কেউ কেউ রোজা রেখেছে, সদকা আদায় করেছে। আমার মেয়ে নীনাও লন্ডনের মতো জায়গায় ২-৩ দিন রোজা রেখেছে। ওখানে রোজার সময়কাল আমাদের দেশের মতো নয়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের ১৫-১৬ ঘন্টা। কাহিনী শুনে সবাই একই কথা বলেন। আপনাকে দোয়া করেনি এমন কোন লোক নেই। সকলের এবং বেহেস্তবাসিনী আপনার মায়ের দোয়ার বদৌলতে আপনি দেশে ফিরে এসেছেন এবং সফল চিকিৎসাও আপনার হয়েছে। তখন ম্লার্কওয়ার্ডের

এক নার্সের কথা মনে পড়ে। যে ওয়ার্ডে আমি ভর্তি হয়েছিলাম সেখানে আরও তিনজন রোগী ছিল। ওরা আছে প্রায় এক বছরের কাছাকাছি। তারা এখনও অসুস্থ পঙ্গু। চলাফেরা করতে পারে না। আর আমি সেখানে মাসখানেকের মধ্যে সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র পেয়েছি। এটা তাদের খুব অবাক করেছে। তাদের দৃষ্টিতে আসলে আমি কতই ভাগ্যবান। পিছনের দিকে তাকালে কৃতজ্ঞচিত্তে উপলব্ধি করি পরম করুণাময়ের অশেষ রহমত ছাড়া এগুলো কিছুতেই সম্ভব হতো না। তাই বলছিঃ হে খোদা এ বান্দার ওপর রহমত দানিয়াছ বারেবারে।

বাংলাদেশ মিশনের প্রধান জনাব মোহাম্মদ আলী তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য কর্মকর্তা প্রথমে আমার খবর নিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর ADC প্রায় প্রতিদিন খবর নিয়ে আমাকে এবং আমার পরিবারকে উৎসাহিত করেছেন ।

দ্বিতীয় এবং প্রথম ঘটনার পর্যালোচনা করলে কিছুটা মিল দেখা যাবে। বিমানের ফ্লাইট যদি দেরী না হত তা হলে আমি হয়ত বুকের ব্যথা তীব্র হবার আগেই প্লেনে আরোহন করতাম এবং আকাশপথে ব্যাথা বাড়লেও ফিরবার কোন উপায় থাকতনা।

তারপর চট্টগ্রামে পৌছারপর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেও প্রয়োজন মত ঔষধ এবং তা প্রয়োগের জন্য অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন চিকিৎসক কিছুই তেমন একটা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। অর্থাৎ আমাকে বিনা চিকিৎসায় ঐ অবস্থায় থাকতে হতো। এদিকে CMH-এর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্নেল রব্বানী যতটুকু আন্তরিকতার সাথে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করছিলেন তা ভুলার নয়। পরে সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে তাকে যখন ধন্যবাদ জানালাম জবাবে সে লিখল এটা আমার কর্তব্য ছিল, "স্যার আপনি আমার শিক্ষাগুরু, আমি মনে করি আমি আমার পিতাকে সেবা করেছি। সেটা আমার জন্য অনেক গৌরবের।"

ভিন্ন দৃষ্টিতে

আমার অসুস্থতা দুটো আপাত দৃষ্টিতে জীবনের একটা দুঃখজনক অধ্যায় হলেও এই ঘটনা আমাকে অনেককে চিনবার জানবার এবং বুঝবার অপূর্ব সুযোগ দিয়েছে। যাদেরকে অজান্তে আপন মনে করতাম যখনই সুযোগ হয়েছে সাধ্য মত সাহায্য করেছি, বিপদে অর্থ প্রদান করেছি, যারা আমাকে পিতৃত্বের আসনে বসিয়ে আন্তরিকতা দাবী করে বহু ফায়দা লুটেছে বিপদের দিনে তাদের আসল রূপ জানবার সুযোগ হয়েছে । যে দুইদিন সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় পার্থিব জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম তখন সকল পাতানো 'ছেলে মেয়েরা' শুধুই যে আশে পাশে ছিলনা তা না, টেলিফোন-এ খবর নেওয়াটাও প্রয়োজন বোধ করেনি। তারা হয়তো ভেবেছিল আমার এই নিদ্রা সজাগ হবার প্রশ্নই উঠে না। তার পাশে বসে থাকা শুধু একটা সময় নষ্ট করা। অর্থাৎ আমার থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফায়দা উঠানো আপাত দৃষ্টিতে যখন অসম্ভব মনে হয়েছিল তখনই সানন্দে আমাকে বর্জন করে ফিরে গিয়েছিল আপন আপন কাজে। আমার পাশে বসে অযথা সময় কাটানো এবং সহযোগিতা করার মতো সময় তাদের ছিলো না। মানব চরিত্রের এটা হলো একটা বিশেষ দিক।

যারা সবচাইতে বেশী ফয়দা উঠিয়েছে, বিপদ-আপদে আমার পরিচয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এ সময় তারাই আমাকে বিসর্জন দিয়েছে । অপরদিকে যাদের সাথে কোনদিন হেসে কথা বলিনি যাদের কোন উপকার করেছি বলে মনে হয় না, সারাজীবন যাদেরকে তেমন মূল্য দিইনি, তাদের কয়েকজন নিতান্ত আন্তরিকতার সাথে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। দিন, রাত খেটেছে আমাকে সাহায্য করতে। এদুই দলের কাহারও নাম দেয়া উচিত মনে করিনা। তবু এমন লোকও আছে যাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেই হবে সঙ্গত কারণে।

কয়েকজনের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা

শেখ রেহানা

আমার এই প্রবন্ধের সাথে কয়েকজনের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো না হলে তাদের প্রতি সুবিচার করা হবে না বলে আমার বিশ্বাস। ক্ষমতার উৎস হিসাবে এই তালিকায় নিজগুণে নিজেকে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন তিনি হলেন "শেখ রেহেনা"। সন্তানদের লেখাপড়ার তাগিদে এখন উনি দেশের বাইরে থাকেন। জাতির পিতার কনিষ্ঠ কন্যা কিংবা বর্তমান মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ছোট বোন হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করা তার পরিবারের রক্তে নাই। দেশের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েও আন্তর্জাতিক ভাবে জাতির পিতার সহধর্মিনী রূপে যার স্বীকৃতি ছিল অটল, তিনি ছিলেন শেখ রেহানার মা, বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুননেসা; চেহারায়, পোশাকে, কথাবার্তায়, চালচলনে একজন সহজ-সরল গাঁয়ের বধু, সকলের প্রতি সমান আচরণ, আত্মীয়তা, সাহায্য সহানুভূতি সবকিছুই তাঁহার অন্তরে ছিল সবার জন্য সমান। এমন একজন আদর্শ মহিলার মেয়ে শেখ রেহানা, এই অসামান্য মহিলার মেয়ে হয়ে রেহানা তাঁর মায়ের গুনের অধিকারী হলেও আমি মনে করি তাঁর মায়ের চরিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর জীবনে। আমার হাসপাতালে অবস্থান কালে এবং বস্তুত তার পূর্বেও আমি এর প্রমাণ পেয়েছি বিভিন্নভাবে।

বঙ্গবন্ধু যখন বন্দী, তাঁর পরিবার যখন যুদ্ধকালীন সময়ে অসহায়, বৃদ্ধ পিতামাতাকে নিয়ে যখন টানাটানি, তখন আমি তাঁদের দুজনকে পিজিতে (বর্তমান "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়")এ চিকিৎসার জন্য নয়মাস রেখে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিচার করে অনেকে ভয় করে এই সময় তাঁদের সাথে দেখা করতেন না। কেন জানি না আমি কোন ভয় পাইনি। আমার মনে এধরনের কোন চিন্তাও আসেনি। দেশে ফেরার পর বঙ্গবন্ধু প্রথম রাতে তাঁর

পিতার কাছ থেকে সমস্ত কাহিনী শোনেন। বৃদ্ধবয়সে কিছুটা অতিরঞ্জিত করে বলা বঙ্গবন্ধুর পিতা মাতার পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। আমার ব্যাপারে তিনি বঙ্গবন্ধুকে তাই বলেছেন বলে আমার বিশ্বাস। সে কারণে বঙ্গবন্ধু আমার সাথে প্রথম সাক্ষাতে সবাইকে বলেছিলেন "He is my father" তিনি আমার পিতা। আমার মা বাবাকে বাঁচিয়েছেন।{সূত্রঃ বঙ্গবন্ধুঃ ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দৃষ্টিতে}পৃঃ ৬৪

মাহমুদা এবং হুমায়ুন

লন্ডনে আমার আত্মীয়-স্বজন অনেক, যাদের নিজের বাড়ী আছে। সেখানে গেলে আমি সাধারণত হুমায়ূন এবং মাহমুদার সাথে থাকি। হুমায়ুন, ডাক্তার মাহমুদা সমাজকর্মী। বিয়ে হবার আগে মাহমুদা আমার সাথে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলে (বর্তমান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের পক্ষ থেকে সমাজসেবী হিসাবে কাজ করত। হুমায়ুন ছিল আমার ছাত্র। মাহমুদার আব্বা নিতান্তই সরল প্রাণের এবং আমার পরম হিতৈষী ছিলেন। একদিন মাহমুদাকে হুমায়ুনের জন্য প্রস্তাব দিল। এদিকে হুমায়ুনও আমাকে খুব শ্রদ্ধা করত। তার মা-বাবা, আত্মীয় স্বজন সবাই সে কারনে প্রস্তাবে রাজি হলেন। হুমায়ুনকে বিলেতে যাবার ব্যাপারে আমি সাহায্য করেছিলাম। জীবনের শুরুতে আমার সামান্য সাহায্য তারা আজও মনে রেখেছে। মাহমুদার আব্বারতো কথাই নাই। প্রতি মূহুর্তে বলতো হুমায়ুন এবং মাহমুদা উভয়ই আমাকে তাদের পিতার স্থানে দেখে। তাদের আন্তরিকতায় এবং আমার প্রতি শ্রদ্ধায় বিন্দু মাত্র কৃত্রিমতা নেই, বরং আছে আন্তরিকতা।

স্বভাবতই আমি একা থাকতে পছন্দ করি না। কোথাও গেলেই পরিচিত দুই একজন বন্ধু বান্ধব ভীড় করে। এখানেও তাই হতো। মাহমুদা সব সময় এদের আপ্যায়ণ করতে কোন দিন বিরক্তি বোধ করতো না, অসন্তোষ দেখাতো না। আমার মনে হতো সে যেন এতে অধিক তৃপ্তি পেত। এবার অসুখে আক্রান্ত হওয়ায় আমার ছেলে ইফতেখার এবং মেয়ে ডাঃ নীনা দুই জনই উপস্থিত হয়। মাহমুদা তাদেরকে নিয়ে লন্ডন হাসপাতালে আমাকে

দেখতে আসে এবং আমার জন্য দোয়া দরুদ পড়ে মাথায় ফু দিয়ে আমার রোগ মুক্তি কামনা করে চলে আসে। রোগশয্যায় ঐগুলো কত শান্তি প্রদান করে তা প্রতিটি ঈমানদার মুসলমান বুঝতে পারেন। আমার হাসপাতাল থাকার দীর্ঘ সময় ইফতেখার ও নীনা ওখানেই ছিলো। খাওয়া দাওয়াতে কোন কার্পণ্যতা ছিলনা। দু'জন চল্লিশদিন নিজের ঘরের মত এখানে বেশ আরামেই কাটল। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর মাহমুদার বাসায় যাই।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর

২৭শে সেপ্টম্বর, ১৯৯৮ সনে আমি হাসপাতাল থেকে বিদায় নিয়ে কোথায় যাব এটা নিয়ে ঝামেলায় পড়ে গেলাম। একদিকে হুমায়ুন-মাহমুদা এবং অন্যদিকে আমার ছোটভাই ফজলুর রহমান (চাটার্ড একাউন্ট) এবং তার স্ত্রী ঝিনু দুজনেই টানাটানি শুরু করেছে। ফজলু কিছুতেই আমাকে ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত তাকে বুঝিয়ে বললাম। যেহেতু আমাকে সপ্তাহে দুদিন ফিজিও থেরাপীর জন্য হাসপাতালে যেতে হবে তাহলে হুমায়ুনের বাসায় থাকাটাই ভাল। কারন হুমায়ুনের বাসা থেকে হসপিটাল যেতে ১৫ মিনিট লাগে আর ফজলুর বাসা থেকে লাগবে প্রায় ১ ঘন্টা। শেষ পর্যন্ত সে রাজী হল এক শর্তে, বাড়ী ফিরার আগে একদিন হলেও তার ওখানে থাকতে হবে। আমি রাজি হলাম। আসলে আমি, ইফতেখার ও নীনা তিনজন ওদের বোঝা হতে চাইনি। অবশ্য ওরা কোন দিন আমাদেরকে বোঝা মনে করে না, এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার ছিল, এখনো আছে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে হুমায়ুনের বাসায় ছিলাম প্রায় ৬-৭ দিন। তখন ঠান্ডা পড়ছিল মাঝে মাঝে কিছু কুয়াশাও হত। সকালে নাস্তা করার পর যে যার যার কর্মস্থলে চলে যেত। ইফতেখার উপরে পড়াশুনা করতো অথবা ঘুমাতো। হুমায়ুনের অভ্যাস ছিল রাতে দেরিতে ঘুমিয়ে দুপুর ১২-১টা পর্যন্ত ঘুমানো। এই সময়ে আমার একমাত্র সাথী ছিল টেলিভিশন। ZEE TV এর সাথে আমার এই প্রথম পরিচয়। উপমহাদেশে চলছে পশ্চিমারা যা মানিয়েছে। হলিউড়কে কোথায় ফেলব জানিনা তবে বোম্বে ফিল্ম সে এত দূর এগিয়ে গেছে তা কোন দিন ভাবতেও পারিনি। কথায় কথায় নাচগান এবং বিসদৃশ এবং অসংলগ্ন অঙ্গভঙ্গী। পোশাকের দিক দিয়ে শালীনতার বালাই নেই। নাচের অঙ্গভঙ্গি

কোমরে ও বুকে সীমাবদ্ধ। তরুন ছেলেমেয়েদের নিয়ে পারিবারিক পরিবেশে এছবি দেখার প্রশ্নই উঠেনা। লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে যেত। আর কোন উপায় ছিলনা। গাড়ী নাই, বাইরে ঘোরবার উপায় ছিলনা। পরের বাড়ীর টেলিফোন ব্যবহার করতেও স্বস্থিবোধ করিনি। একমাত্র সম্বল ছিল টেলিভিশন; আর টেলিভিশন On করলেই এই ZEE TV. অবশ্য BBC ও দেখা যেত। চার-পাঁচ দিনে মনে হয় সারাজীবনের ZEE-TV দেখে নিলাম। এভাবে কোন প্রকারে কয়েকদিন কাটিয়ে দিলাম। মাঝখানে হুমায়ুন এক নতুন প্রশ্ন তুলল, একজন Vascular Surgeon এর মতামত নেয়া উচিত। Dr Rudd ছিলেন একজন Cardiologist. যিনি মত দিয়েছেন অপারেশনের প্রয়োজন নেই। হুমায়ুনের মতে একজন Vascular Surgeon এর মতামত না নিয়ে আমার বাড়ী ফেরা উচিত হবেনা। আমি কিন্তু সহজে রাজি হইনি। সে যে ডাক্তারের পরামর্শের কথা বলেছে তিনি যদি অপারেশনের কথা বলে তাহলে ঝামেলায় পড়ব। তখন মনে হবে কে ঠিক, Cardiologist না Vascular Surgeon. তখন আমাকে অন্য একটা মত নিতে হবে। তিনজনের মধ্যে যেখানে দু'জন একমত সেটাই গ্রহন করতে হবে। ডাঃ হুমায়ুন এবং ডাঃ ইয়াহিয়া ইকবাল (আমার মামাত ভাই) দুজনই রাজি হল। এদিকে হুমায়ুন আমার সাথে দেখা করার সময়ও ঠিক করেছিল। ইয়াহিয়ার মতে সে একজন পারদর্শী। তা হলেতো এত অল্প সময়ে তার দেখা পাওয়া কঠিন। আবার ডাঃ ইয়াহিয়াও খুব চিন্তিত ছিল। নির্ধারিত দিনের একদিন আগে সে বার্কিংহাম থেকে লন্ডনে হুমায়ুনের বাসায় চলে আসে। পরের দিন হুমায়ুন, আমি, ইয়াহিয়া এবং নীনা ডাঃ Toylor এর চেম্বারে যাই। তিনি আমাকে দেখার পর MRA Report গুলো দেখে নিলেন এবং বললেন এত সুন্দর MRA তিনি খুবই কমই দেখেছেন। Colateral circulation এখানে established হয়েছে। সব কিছুর পরে এখন আর নতুন অপারেশন করে একটা ঝুকি নেওয়া ভাল হবে না। মনে মনে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করলাম এবং পরিতৃপ্ত মনে বাসায় ফিরে আসি। ডাঃ Rudd এবং Toylor এর মত শুনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। শুরুতে হুমায়ুনের পীড়াপীড়ি আমাকে বিরক্ত করলেও তাকে মনে মনে দোয়া করলাম। আমার জন্য তার উদ্যোগ, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি

আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই বিপদের দিনে আরও বহুগুন মুগ্ধ হলাম। বস্তুত হুমায়ুন ইয়াহিয়া আমার আপনজন। যখনই আমি লন্ডন যাই তখনই বহুদুর থেকে ইয়াহিয়া ছুটে আসে এর ব্যতিক্রম কোন দিন হয়নি। আমার এই অপ্রত্যাশিত অসুখে সে যে অবশ্যই আসবে এতে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। এবারও ইয়াহিয়া সেটাই প্রমান করলো। প্রায় দুই বছর আগে কোলেস্ট্রল কমানোর ঔষধ খেতে সে আমাকে বারবার অনুরোধ করেছিল। তাতে আমি কান দেয়নি। এতদিন পর আমি বুঝতে পারলাম সে বলেছিল ঠিক বরং আমিই ভুল করেছিলাম। আমার এই অসুখের পর সে বারবার দুঃখ করে এই কথাই বলছিল যে, যেন আমি ঔষধটা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চালিয়ে যাই। সুখের পায়রার যেমন অভাব নাই, তেমনি বিপদেও এখনও কিছু কিছু আছে। আসার সময় যারা আমার জন্য অন্তর থেকে দোয়া করেছেন, খোঁজখবর নিয়েছেন, আমার পরিবারকে সান্তনা দিয়েছেন তাদেরও সংখ্যা কম নয়। পরিবারের সদস্য এবং নিকট আত্মীয়ের কথা ছেড়ে দিলেও এমন লোকের সংখ্যা অনেক। তাদের সম্পর্কে লিখতে গেলে তা শেষ হবে না। তবুও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে বিশেষ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করলাম। তাঁরা হলেন-------

* মাহমুদা এবং ভাগিনা ডাঃ হুমায়ুন কবীর
* ডাঃ আলাউদ্দীন, আমার সিন্ডিকেট সদস্য
* ইঞ্জিনিয়ার আফসার উদ্দিন
* মোঃ এম, এ, সালাম,
* বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং শিল্পপতি নূরে আলম সিদ্দিকী,
* শ্রদ্ধেয় আইনজীবি ব্যারিস্টার ইস্তিয়াক আহ্মেদ,
* বিচারপতি ছিদ্দিক আহমদ চৌধুরী,
* মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুবীন খান ও মুজিবুর রহমান (রক্ত সঞ্চালন বিভাগ) এবং আরো অনেক।
* অধ্যাপক ডাঃ মাহমুদ হাসান, আজাদ খান, হাজেরা মাহতাব
* ১৯৭৪ সালের পরিচিত লন্ডনবাসী জনাব ইউসুফ প্রতিদিনই আসতেন
* জনাব মাহমুদুল ইসলাম, এটর্নি জেনারেল এবং ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইস্তিয়াক আহ্মেদ প্রায়ই আমার বাসায় ফোন করে খবরা খবর নিতেন।

এঁরা প্রায় প্রতিদিন আমার খবর নিতেন। শেখ রেহানার ব্যবহার ছিল আমার মেয়ের মত। লন্ডনের বাহিরে থেকে নিজ ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেক টাকা খরচ করে খাবার ইত্যাদি নিয়ে সে এসে সেবা করত। আমি নিষেধ করলেও সে আসত।

বঙ্গবন্ধু পরিবার

ব্যক্তিগতভাবে এই পরিবারের সাথে নানা কারণে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধু সুদীর্ঘ নয় মাস ধরেই পাকিস্থানের কারাগারে বন্দী। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর আশংকা। শেষ পর্য্যন্ত একদিন পরাজয় বরণ করে পাকিস্থান বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং বঙ্গবন্ধু মুক্তি পায়। একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা একদিন কথায় কথায় আমাকে বললেন, রেহানা যেভাবে আপনার কথা আমাদের বলেছে, তাতে মনে হয়েছিল সে আপনারই মেয়ে। জবাবে আমি বললাম, সে তাঁর মায়ের প্রতিচ্ছবি। বেগম মুজিব সবাইকে সমান ভাবে দেখতেন। তাঁর কাছে বড় ছোট কেউ ছিল না। সদা হাসিমুখে সরলভাবে পান মুখে দিয়ে তিনি সবার সাথে কথা বলতেন। কোন দিন কিছুর জন্য স্বপ্ন দেখেননি। কেউ দিলেও তৎক্ষনাৎ প্রত্যাখ্যান করতেন। নিঃসন্দেহে তিনি কত সরল, চোখে মুখে বুঝা যেত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ইঞ্জিনিয়ার আফসার উদ্দিন আহম্মদ (আফসার)

এক্স এম, পি , আফসার আমার নিকট আত্মীয়, সম্পর্কে মামাতো ভাই। শুধু দাদা বলে সম্বোধন নয়, সম্মানও করে। আমার অসুখের কথা শুনে নীনা ও ইফ্তেখারের ভিসা এবং টিকেট সেই করে দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীকে জানাবার পর তিনি তৎক্ষনাৎ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশ High Commission কে fax করে যথাযথ ব্যবস্থাপনার নির্দেশ দান করেন। এ দু'জনকে যথেষ্ট পরিমানে কৃতজ্ঞতা জানানো এবং ধন্যবাদ দেয়া সম্ভব নয়। তবু আফসার আমার জন্য তার ব্যবসা বাণিজ্য বাদ রেখে আমার সাথে থেকে গিয়েছিল এবং ছোট মামা একে এম ফজলুল কবীর চৌধুরী, মামাত

ভাই ফজলু, আফসারের ছেলে আসিফ, এয়াহিয়া, হুমায়ুন কবীর, মাহমুদা, এদের কেউ না কেউ আমার সাথে থাকত। ধন্যবাদ জানানো এদের দাবী নয়, তবুও তাদের নাম বাদ দিলে ন্যায় বিচার হবে না। আমি তাদের কথা ভুলতে পারবো না।

বস্তুতঃ এ বর্ণনা ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে একটি শিক্ষনীয় উদাহরণ হিসেবে রূপ নেবে এ বিশ্বাস রেখে আমার এ ক্ষুদ্র সংকলন, শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, কর্তব্য হিসাবে এ প্রকাশনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এ বিশ্বাস রইল। মঙ্গলময় সকলের মঙ্গল করুন। সকলের দোয়ায় আমি যেন সৎপথে চলে ভালকাজ করতে পারি এ প্রত্যাশা রইল।

উপসংহার

যে উদ্দ্যেশ্য নিয়ে আমার জীবনের এ দুটো ক্ষুদ্র ঘটনার বর্নণা তার গভীরে চিন্তশীল ধর্মপ্রাণ লোকদের জন্য অনেক কিছু জানবার, বুঝবার এবং শিখবার আছে। যেমনঃ

১. আমাদের সবকিছু পরম করুণাময়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

২. যিনি জীবন দিয়েছেন তিনি জীবন নিতেও পারেন। এর জন্য তাঁর ইচ্ছাই যথেষ্ট ।

৩. আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা মনে সাহস যোগায়, ভয় থাকেনা। প্রশান্তি মুক্তির সহায়ক।

৪. জনগণের দোয়া আল্লাহর দরবারে পৌঁছায়, তিনি কবুল করেন।

৫. মায়ের দোয়া মহা শক্তিশালী।

লন্ডনে এবং দেশের অগনিত জনসাধারণ আমার জন্য যে দোয়া করেছেন তারই ফলশ্রুতিতে এবং আমার মায়ের দোয়াই এখনোও আমি বেঁচে আছি। তাঁদের ঋণ শোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সকলের দোয়া চাই যেন সুস্থদেহে সকলের সেবা করতে পারি এবং আমার প্রতিষ্টান (ইউ,এস,টি,সি) যেন জনসেবায় উজ্জল দৃষ্টান্ত হতে পারে।

- The Direction in which education starts a man, will determine his future life. - Plato
  যে লক্ষ্যে শিক্ষার সূচনা তার উপর মানুষের ভবিষ্যত ।
  - প্লেটো

- The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. - Aristotle
  শিক্ষার শিকড় তিক্ত, সুফল মধুর ।
  -এরিস্টটল

- Who so neglects learning in his youth, loses the past and is dead for the future. - Euripides.
  যৌবনে যে শিখতে চায়না, সে অতীত হারিয়ে ফেলে এবং ভবিষ্যতের জন্য মৃত্যু ডেকে আনে । - ইউরিপিডস্

- A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops. - Henry Adams.
  শিক্ষকের আবেদন চিরন্তন, কোথায় তার শেষ তিনি জানেন না ।
  -হেনরী এডামস

- Without knowledge, life is no more than the shadow of death. -Moliers.
  জ্ঞানহীন জীবন মৃত্যুর ছায়া ছাড়া আর কিছু নয় ।
  - মলিয়ার্স

- Fear Allah and live with honest people- Al-Quran
  আল্লাহকে ভয় কর এবং সাধুগণের সঙ্গে বাস কর- আল-কোরান ।

- One who sees only the darker side of a man would better be blind. -Montaigne.
  যে শুধু মানুষের খারাপ দিকগুলি দেখে তার অন্ধ হওয়াই ভাল ছিল
  - মন্টেইন ।

- Truth fears no trial. -Thomas Fuller.
  সত্য বিচারের মুখোমুখি হতে নির্ভয় -টমাস ফুলার ।

- There would be too great darkness, if truth had not visible signs. -Pascal.
  সত্য ভাস্বর নইলে অন্ধকারের গভীরতা বেড়ে যেতো - পাসকেল ।

- A liar ruins himself first. -Hasan Basri.
  মিথ্যাবাদী সর্বপ্রথম নিজের সর্বনাশ করে - হাসান বসরী ।